কেন এত অধঃপতন?

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবরার হত্যা সারা জাতিকে নাড়া দিয়েছে। বাঙালি জাতির ভিতর এমন পশুত্ব লুকিয়ে ছিল আমরা অনেকে তা ভাবতেই পারিনি। এ রকম ঠান্ডা মাথায় কয়েক ঘণ্টা পিটিয়ে কোনো মানুষকে হত্যা করা যায়, তাও আবার যুব বয়সে, যখন দয়া-মায়া-মমতা-ভালোবাসা থাকে চনমনে যে বয়স সম্মানের জন্য জীবন দেওয়ার, যে বয়স যুদ্ধে যাওয়ার, সেই বয়সে এমন বর্বরোচিত হত্যা- কল্পনাও করা যায় না।

আমি সন্তানদের দোষ দিই না, দোষ দিই আমাদের। একজন মানুষ ভিন্নমত প্রকাশ করলে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হতে হবে তাও আবার এতটা, জীবন কেড়ে নেওয়ার মতো ক্ষুব্ধতা- এ কোনো সুস্থ সমাজে চিন্তা করা যায় না, যেটা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে। তারপর আবার ছাত্র রাজনীতি নিয়ে যেসব কথা হচ্ছে সে তো আরও অভাবনীয়। এ রকম দানবীয় কর্মকান্ডের সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির সম্পর্ক কী, কাউকে খুন বা নির্যাতন করা তো রাজনীতি নয়- সেটা জাতীয়-যুব-ছাত্র যা-ই বলি না কেন। ছাত্র রাজনীতিও একটা শিক্ষা। প্রকৃত ছাত্র রাজনীতি যে শিখবে জানবে তার হাতে জাতির নেতৃত্ব নিরাপদ হবে, দেশ স্থিতিশীল সমৃদ্ধ হবে। ‘সব শিয়ালের এক রা’-র মতো অনেকের কণ্ঠেই আইয়ুব-মোনায়েমের মতো ছাত্র রাজনীতি বন্ধের হুক্কা-হুয়া শুনছি। আস্তে আস্তে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ছি। তবু ছাত্র-যুবকদের মুখ চেয়ে থাকি। এই তো কদিন আগে নিরাপদ সড়কের দাবিতে আমাদের সন্তানরা রাস্তায় নেমে দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে দিয়েছিল- কি চমৎকারই না লেগেছে। আমি তো ভরসা পেয়েছি। মনে হয়েছে, আমরা মরিনি, এখনো বেঁচে আছি। তাই ছাত্র রাজনীতি নয়, যেসব কারণে ছাত্র-যুবক ও সাধারণ মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলো আস্তে আস্তে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে সেসব কারণ দূর করতে হবে। সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে একজন উৎসাহী দর্শক বা শ্রোতা ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে আরও খুশি হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। নিজের কাছেই বিব্রত লেগেছে এক সাংবাদিক যখন বললেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যতক্ষণ আপনি না বলেন ততক্ষণ কিছুই হয় না। তাহলে এত বড় মন্ত্রিসভা, এত লোকজনের প্রয়োজন কী?’ প্রধানমন্ত্রী যেভাবে উত্তর দিয়েছেন প্রশ্নকারী ওভাবে আশা করেননি, অন্যরাও করেননি। মনে হয় প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য প্রায় সবাই প্রশ্ন করেন। যে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর অভিজ্ঞতা মেধার প্রকাশ বা বিকাশ ঘটাতে পারেন না। যে যাই বলুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবারের ভারত

সফরে লাভবান হননি। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলছি না, লাভবান হওয়ার কথা বলছি। পদে পদে আমাদের যেখানে লাভবান হওয়ার কথা সেখানে সত্যিই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত। তবে ফেনী নদী থেকে পানি দিয়ে আমাদের লাভই হয়েছে। চুক্তি হয়েছে এক-দেড় কিউসেক পানি দেওয়ার। কিন্তু ভারত এমনিতেই তার চেয়ে অনেক বেশি পানি নিচ্ছে। সামর্থ্য থাকলে অনেক কিছুই করা যায়। বহু বছর আগে এক সওদাগরের গল্প পড়েছিলাম। সওদাগরের সঙ্গে নদীপথে ভ্রমণের সময় তার স্ত্রীর কথার মিল না হওয়ায় নদীর পাড়ে নামিয়ে দেয়। সেখানে এক অশিক্ষিত কৃষক যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তার যৎসামান্য টাকা-পয়সা সোনা-দানা যা ছিল তা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অশিক্ষিত কৃষক যুবককে শিক্ষিত করে সেই রাজ্যের প্রথমে নায়েব তারপর আস্তে আস্তে প্রধানমন্ত্রী বানায়। সওদাগর স্ত্রীকে যেখানে ফেলে গিয়েছিল একসময় সেখানে বিরাট নৌবন্দর হয়। ব্যবসার জন্য এক শ্রেষ্ঠ স্থান। একবার সে বন্দরে ভিড়তে পারলে সাত রাজার ধন অর্জন করা যায়। সওদাগর ঘুরতে ঘুরতে একসময় সেই বন্দরে আসে। সেই বন্দরের সব কর্তৃত্ব তখন তার ফেলে যাওয়া সেই স্ত্রীর হাতে। সওদাগর বন্দর অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চায়। একদিন তাকে দেখার সময় দেওয়া হয়। সওদাগর দেখা করতে গেলে তাকে বিশাল বৈঠকখানায় সমাদরে বসানো হয়। সওদাগরের আগের গৃহিণী বন্দর অধ্যক্ষ তখন স্নানাগারে ছিল। স্নান শেষে সে তার স্যান্ডেল চাচ্ছিল। কয়েকবার ডাক দেওয়ায় আশপাশে কাউকে না দেখে সওদাগরই তার স্যান্ডেল স্নানাগারে এগিয়ে দেয়। সওদাগর ভদ্রতার খাতিরে কাজটি করেছিল। কিন্তু স্নানাগার থেকে তার সাবেক স্ত্রীকে বেরিয়ে আসতে দেখে সওদাগর অবাক হয়ে যায়। বন্দর অধ্যক্ষ সুন্দরী রমণী সওদাগরকে বলে, ‘কেন, ফেলে যাওয়ার সময় বলেছিলাম না, একদিন তোমাকে দিয়ে আমার জুতা টানাব। কথাটা কি মনে আছে?’ বিশাল সম্পদের মালিক সওদাগর। খুব অপমানবোধ করে। সাক্ষাৎ শেষে উজানে তার এলাকায় ফিরে যায়। সে বহু টাকা খরচ করে উজানের নদীর মুখ ঘুরিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে বন্দরের পানিপ্রবাহে টান পড়ায় সুজলা-সুফলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দর শুকিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। ফেনী নদীর ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম। ফেনী নদী আগে ভারতে ছিল না, ছিল বাংলাদেশে। ভারত তাদের সীমানার মধ্যে একটা টিলার পেছনে বড় করে খাল খনন করে পানির গতি ঘুরিয়ে দেয়, যাতে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী খালকাটা ভারতীয় ভূমির ওপর দিয়ে দারুণ বেগে বয়ে চলে নতুন বউয়ের নাইওরি যাওয়ার মতো একটু ঘুরে আসে। তাই ওটা এখন ভারতেরও নদী। তবে মজার ব্যাপার, ভারত এখন এক পাম্পে দেড় কিউসেকের মতো পানি নেবে। অথচ চুক্তি ছাড়াই তারা ৩৬ পাম্পে পানি তুলে চাষাবাদ করছে- এখানে মনে হয় চুক্তি করে ভারত মারাত্মকভাবে ফেঁসে গেছে।

দলের কেউ শান্তিতে নেই। সবাই এক মারাত্মক অস্বস্তিতে ভুগছেন। কখন কী হয় কী হয় ত্রাহি ত্রাহি ভাব। ছাত্রলীগ-যুবলীগ বলতে গেলে প্রায় একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। তাদের এত দিন রাজনীতির শক্তিই ছিল চাঁদাবাজি-দখলবাজি। সেসবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হওয়ায় তারা প্রায় সবাই ফেরারি, পথের কাঙাল। ঢাকার রাস্তাঘাটে অসংখ্য ফকির-মিসকিন দেখা যায়, তাদেরও চলার একটা পথ আছে। কিন্তু দানবীয় ছাত্রলীগ-লুটেরা যুবলীগের কোনো পথ নেই। হঠাৎই নূরে আলম সিদ্দিকীর পত্রিকায় অনুভূতি দেখলাম। সত্যিই আমাদের অনেকের জীবনের প্রধান গর্ব আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আমরা ছাত্রলীগ করেছি। আমি আবার এক পা এগিয়ে শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গে যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সত্যিই এখন মাঝেমধ্যে মনে হয় ছাত্রলীগ-যুবলীগের এসব কদর্য চেহারা দেখার আগে কেন আমাদের মৃত্যু হলো না। মৃত্যু হলে সেটাই হয়তো ভালো হতো। এমন জিনিস তো আমরা দেখতে চাইনি। যেজন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি এখন প্রায় সবই তার উল্টো। কবে এর শেষ হবে আমাদের জীবদ্দশায় হবে কিনা? আমরা কি এর শেষ দেখে যেতে পারব, আলোর ঝিলিক কি দেখা দেবে? বড় দুর্ভাবনায় আছি।

কদিন আগে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। গ্রামের মানুষ যা বোঝে তাই বলে। কেউ কেউ বলছিল, এখন তো মূল দল আওয়ামী লীগের পালা। যুবলীগ সভাপতি, অন্য সম্পাদকরা একের পর এক গ্রেফতার হচ্ছেন, ধরা পড়ছেন। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও কি গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা আছে? প্রশ্নটা অনেকটাই ছিল আমার উদ্দেশে। কোনো জবাব দিতে পারিনি। এ দেশে কিছুই বিশ্বাস করা যায় না। কী বলি কার কপালে কী আছে। কেমন যেন এক অন্ধকার গহ্বরের দিকে ধেয়ে চলেছি। গ্রামের লোকজন আমাকে পেয়ে তাদের শত কথা, শত চিন্তা আতশবাজির মতো ছুড়ে মারে। বিশেষ করে সেটা ছিল একটি বিয়ের অনুষ্ঠান। আমি উৎসাহ করে গিয়েছিলাম। কারণ দুঃসময়ের অনেক কিছুই ভুলতে বা উপেক্ষা করতে পারি না। আজ যারা বড় বড় নেতা তারা বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার দিন কে কোথায় কীভাবে ছিলেন, হত্যার পক্ষে না বিপক্ষে বলতে পারব না। কিন্তু সে ছিল আমার জীবনের এক চরম দুর্দিন। অসুস্থ মা পিজি হাসপাতালে, বাবা টাঙ্গাইলে, বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের পথে। হঠাৎই খবর পাই, বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। আসমান ভেঙে পড়ে কোথায় যাব, কী করব? বেতারের খবর কতটা সত্য কতটা মিথ্যা সে এক বিরাট দুঃসময়। সেই সময় সকাল সাড়ে ৫টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্যার সৈয়দ রোডে উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক দাদু মোহাম্মদ মোদাব্বেরের বাড়ি গিয়েছিলাম। দিনটি ছিল শুক্রবার। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। জুমার নামাজের

পর কারফিউ তুলে দিলে স্যার সৈয়দ রোডের বাড়ি থেকে সবুর দারোগার খিলজি রোডের বাড়ি গিয়েছিলাম। সবুর দারোগা আজীবন মুসলিম লীগ করতেন। তাই তেমন ভরসা ছিল না। কিন্তু তিনি আগাগোড়াই অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তার ছেলে এবং মেয়ের জামাই বীর মুক্তিযোদ্ধা। আরিফ আহমেদ দুলাল তাই জোর করছিল সবুর দারোগার বাড়ি নিরাপদ হবে। আমিও যে ৮-১০ ঘণ্টা ছিলাম, সত্যিই বাড়িটি মহানিরাপদ মনে হয়েছিল। সারা দিন সবুর দারোগা অথবা তার স্ত্রী আমাকে একা হতে দেননি। কেউ না কেউ মাথার কাছে অথবা পায়ের কাছে নিরন্তর বসে থেকেছেন। আমার মা ছাড়া অন্য কেউ কখনো আমার পাশে ওভাবে বসে থাকেনি। খিলজি রোডের বাড়ি থেকে আমি মাংস খাওয়া ছেড়েছিলাম। বিকালে যখন মন্ত্রিসভার শপথ হয়, সব বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার মন্ত্রী। সন্ধ্যা ৭টার মতো হবে সারা দিন শেষে মুখে ভাত দিয়েছিলাম, মনে হয় এক টুকরো মাংসও মুখে দিয়েছিলাম। মাংস মুখে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন পিতার মাংস চিবিয়ে খাচ্ছি। থু থু করে মুখের আহার ফেলে দিয়েছিলাম। চোখ থেকে অঝরে পানি ঝরছিল। শুনেছি ভাতের থালায় চোখের পানি পড়া নির্মম অপরাধ। ৪৫-৪৬ বছরেও আমার সে অপরাধ শেষ হলো না, দুঃখ ঘুচল না। খিলজি রোডের বাড়ি থেকে জিগাতলা মোহনদের বাড়ি, সেখান থেকে কুতুবের বোনের বাড়ি। তারপর বানিয়ারার খোকন, সবশেষে আর এ গনির বাড়ি থেকে দুলাল, লুৎফর, ইউসুফ, রেজাউল করিম, বগুড়া যুবলীগের সভাপতি খসরুকে নিয়ে সীমান্তের উদ্দেশে পাড়ি জমাই। হঠাৎ করে সিলিমপুরে সবুর দারোগার নাতনি, অ্যাডভোকেট সিরাজের ভাতিজি এবং আবুল হোসেন মাখনের মেয়ে স্বর্ণার বিয়েতে বড় বেশি করে ১৫ আগস্ট ’৭৫-এর সেই দিনের কথা মনে পড়ছিল। বিশেষ করে শাহাদত, মজিবর, ফরহাদকে দেখে। চরম দুর্দিনের কয়েকটা ঘণ্টা কী যত্নই-না ওরা করেছিল। আমার বাঁ- পাশে বসেছিল আবুল, আমার থেকে সাত-আট বছরের ছোট হলেও দাঁতটাত পড়ে বুড়ো হয়ে গেছে। সবুর খান বীরবিক্রম, আবুল, শোকন, আজাদ, ইকবাল, ফারুক, মতি, মিন্টু, মণি সাহা, মনীন্দ্রমোহনরা ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সময়ের যোদ্ধা। সাটিয়াচরা প্রতিরোধ যুদ্ধের পর টাঙ্গাইল হয়ে চারান-ছাতিহাটি-মরিচা-বড়চওনা থেকে মধুপুর-ময়মনসিংহ হয়ে ফুলবাড়িয়া। সেখান থেকে হালুয়াঘাটে কুদরত উল্যাহ ম-ল এমপির সঙ্গে আলোচনা করে ফেরার পথে গ্রেফতার হয়ে আবার সীমান্তের হাতীপাগারে সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছে চালান হই। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে আবার টাঙ্গাইল মুক্ত এলাকায় ফিরে এসেছিলাম। তারপর কাদেরিয়া বাহিনী গঠন। সেই যাত্রায় সবুর খান বীরবিক্রম, আবুল, শোকন, আজাদ, ইকবাল, ফারুক, মতি, মিন্টু, মণি সাহা, মনীন্দ্রমোহন ছিল। দেশ স্বাভাবিকভাবে চললে প্রথম কাতারের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবুলদের স্থান থাকত সবার ওপরে। কিন্তু আজ কেউ ওদের জিজ্ঞাসা করে না।

দোয়া করি, সাবরিনা জেবিন স্বর্ণা এবং মো. ইমরান সরকারের জীবন আনন্দময় সুখের হোক।

লেখক : বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি